بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Book#19

www.motaher21.net

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি।"

"YOU ARE THE BEST"

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ

তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে।[১] গ্রন্থধারিগণ যদি বিশ্বাস করত, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত। তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে,[২] কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

মুসলিম উম্মতকে ‘শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়’ বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কুরআনুল কারীম একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম উম্মতের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থে সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ করার দায়িত্ব অধিকতর পুর্ণত্বলাভ করেছে। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুণ দ্বীনের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ উম্মতের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে– যারা ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ’ – এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে। আবুল আলিয়া বলেন, এ উম্মতের চেয়ে বেশি কোন উম্মত ইসলামের আহবানে সাড়া দেয়নি, ফলে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। [ইবন আবী হাতেম] আয়াতে এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ বলার সাথে সাথে তাদের কর্ম কেমন হওয়া উচিত তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মা’রুফ বা সৎকাজ হচ্ছে, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দেয়া, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেগুলোর স্বীকৃতি দেয়া এবং তার উপর কাফের মুশরিকদের সাথে জিহাদে থাকা। আর সবচেয়ে বড় মা’রুফ বা সৎকাজ হচ্ছে,

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতি আদায় করা। পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় মুনকার বা অসৎকাজ হচ্ছে, মিথ্যারোপ করা। [তাবারী]

এই আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মত গণ্য করা হয়েছে এবং তার কারণ কি তাও বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হল, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখা। অর্থাৎ, মুসলিম উম্মার মধ্যে যদি এই (ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখার) বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত। অন্যথা এই উপাধি থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এরপর আহলে কিতাবের নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যে, যদি এই উম্মত ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না করে, তাহলে তারাও তাদের মত বিবেচিত হবে। কেননা আহলে কিতাবের গুণ হল,[كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ] "তারা যে মন্দ কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না।" (মায়েদাহঃ ৭৯) এখানে এই আয়াতে তাদের অধিকাংশ লোককে ফাসেক বলা হয়েছে। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করার শরয়ী মান 'ফারযে আইন' (যা করা উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয), নাকি 'ফারযে কিফায়াহ' (যা উম্মতের কিছু লোক সম্পাদন করলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে, আর কেউ না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।)? অধিকাংশ আলেমের মতে এটা 'ফারযে কিফায়াহ'। অর্থাৎ, আলেমদের দায়িত্ব হল, তাঁরা এই ফরয আদায় করবেন। কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাল ও মন্দ নির্বাচনের সঠিক জ্ঞান তাঁদেরই আছে। তাঁরা যদি দ্বীনের দাওয়াত ও তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে উম্মতের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ ফরয আদায় হয়ে যাবে। যেমন, জিহাদও সাধারণ অবস্থায় 'ফারযে কিফায়া'। অর্থাৎ, কোন একটি দল এ কাজ আদায় করলেই তা যথেষ্ট হবে। (অনেকের মতে উক্ত আদেশ ও নিষেধ করার কাজ নিজ নিজ জ্ঞান ও সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের উপর ফরয। আর এ কথাই সঠিক বলে মনে হয়। অল্লাহু আ'লাম। -সম্পাদক)

[২] যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ও অন্য কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের সংখ্যা খুবই স্বল্প ছিল। আর এই জন্যই 'مِنْهُمْ' এ مِن 'হারফে তাব্‌ঈয' তথা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে [১]; আর তারাই সফলকাম।

[১] ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পূণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যে সব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লেখিত মারুফ তথা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'মারুফ' শব্দের আভিধানিক

অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্ম সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে ‘মারুফ’ বলা হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব অসৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত মুনকার’ এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে ‘ওয়াজিবাত’ অর্থাৎ জরুরী করণীয় কাজ ও ‘মা’আসী’ অর্থাৎ ‘গোনাহর কাজ’ –এর পরিবর্তে ‘মারুফ’ ও ‘মুনকার’ বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা–মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন খারাপ কাজ দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘এর পরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও বাকী নেই। [মুসলিমঃ ৪৯, আবু দাউদঃ ১১৪০]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অচিরেই আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযিল করবেন। তারপর তোমরা অবশ্যই তাঁর কাছে দো’আ করবে, কিন্তু তোমাদের দোআ কবুল করা হবে না। [তিরমিযীঃ ২১৬৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৯১]

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন লোক সবচেয়ে বেশী ভাল? তিনি বললেনঃ সবচেয়ে ভাল লোক হল যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে, সৎকাজে আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৩১]

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহবান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, 'অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত [১]।'

[১] এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? মুমিনদের সান্ত্বনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগের আয়াতে তাদের বলা হয়েছিলো, আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায়। এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ–মুসিবতকে আহবান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে:

আমি মুসলিম। মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চস্তর আর নেই। কিন্তু আমি মুসলিম বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা, পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী। এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করে। এ কারণেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে دَعَآ اِلَى اللهِ বাক্যের পর وَعَمِلَ صَالِحًا বলে আযান-ইকামতের মধ্যস্থলে দুরাকাআত সালাত বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আযান ও একমাতের মাঝখানে যে দো'আ হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। [আবু দাউদ: ৫২১]

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ..... الْمُسْلِمِيْنَ)

যারা আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষকে আহ্বান করে ও সাথে সাথে নিজে সৎ আমল করে এবং বলে আমি আল্লাহ তা'আলার বিধানের কাছে আত্মসমর্পণকারী, সে ব্যক্তির কথা পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ- এ কথাই এখানে প্রতীয়মান হয়েছে। ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন : এ আয়াতটি ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য যারা নিজেরা সৎ পথে চলে এবং অন্যদেরকে দাওয়াত প্রদান করে। এ দাওয়াতী কাজে মানুষকে দীন শিক্ষা দেয়া, ওয়াজ নসিহত করা, দীনের ওপর অটল থাকতে উৎসাহ প্রদান করা সব কিছুই শামিল (তাফসীর সাদী, অত্র আয়াতের তাফসীর)। এ আয়াতে মূলত এটাই সাব্যস্ত হয় যে, নিজে ভাল কাজ করতে হবে এবং সাথে সাথে মানুষকে ভাল কাজ করার জন্য, আল্লাহ তা'আলার একত্বের দিকে তাঁর ইবাদত করার জন্য আহ্বান করতে হবে। শুধু নিজে করলেই চলবে না বরং সকলকে এ কাজের দিকে দা'ওয়াত দিতে হবে। যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে ইসলাম ও দীনের পথে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। সুতরাং যারা ভাল কাজ করে এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে সে হলো সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সম্মানিত ব্যক্তি।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার পদ্ধতি এবং উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা করছেন যে, যারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করবে তারা যেন নম্র-ভদ্রভাবে এবং সুন্দরভাবে আল্লাহ তা'আলার পথে আহ্বান করে। মন্দকে দূরীভূত করে ভাল দ্বারা। যা উৎকৃষ্ট তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করতে হবে। অর্থাৎ অন্যায়ের বদলা নিতে হবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা, জুলুমের বদলা নিতে হবে ক্ষমা করে, ক্রোধের বদলা নিতে হবে ধৈর্য ধারণ করে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। বল : 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে,

আর ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে।’ (সূরা মু’মিনূন ২৩ : ৯৬-৯৮)

ফলে এতে করে উপকারিতা হলো : শত্র“ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে, তোমার থেকে দূরে দূরে থাকত এমন ব্যক্তি নিকটতম হয়ে যাবে। আর এ গুণটা অর্থাৎ মন্দকে ভাল দ্বারা পরিবর্তন করার অভ্যাস সকল মানুষের মধ্যে থাকে না, শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিই এটা করতে সক্ষম যারা ধৈর্য ধারণ করতে পারে, রাগকে দমন করতে পারে এবং অপছন্দনীয় কথা-বার্তা সহ্য করতে পারে। এটা তাদের দ্বারাই সম্ভব, অন্য কারো পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : যদি ভাল কাজ করতে গিয়ে শয়তান তোমাকে কুমন্ত্রণা দেয় তাহলে তুমি মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা এক আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কারো নেই।

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি [১], যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্ তা’আলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফের, বেঈমান ও দূরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন কিয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, হে আল্লাহ! কোন কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন কাজে আপনি অসন্তুষ্ট হন, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ তা’আলা স্পষ্ট নিদর্শনসহ নবীগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহর ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার মোকাবেলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কুরআনুল কারম এমন এক অকাট্য দলীল যার সামনে কোন অযুক্তি টিকতে পারে না।

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

'হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর তোমার উপর যা আপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এটা অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

১৩-১৯ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে আল্লাহ তা'আলা লুকমান হাকীমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে একজন আদর্শ পিতার সন্তানের প্রতি কী করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরেছেন। লুকমান (عليه السلام) তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন ও উপদেশ দিয়েছিলেন সে সকল উপদেশ যদি প্রতিটি পিতা তার সন্তানকে প্রদান করেন তাহলে প্রত্যেক পরিবার, সমাজ ও দেশ আদর্শ পরিবার, সমাজ ও দেশে পরিণত হবে। লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে যে নসীহত ও উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলো হলন

প্রথম উপদেশ:

তিনি তাঁর ছেলেকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কে সচেতন করে বললেন: একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, কখনো আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করবে না। কেননা শির্ক একটি বড় ধরনের জুলুম। হাদীসে এসেছে, ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন

(الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)

-এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন সাহাবীদের নিকট বিষয়টি খুবই কঠিন মনে হল। তারা বলল: আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে জুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বিষয়টি এরূপ নয়। তোমরা লুকমান (عليه السلام)-এর কথা শুননি? সে তার সন্তানকে বলেছিলন

(إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ)

-নিশ্চয়ই শির্ক মহা জুলুম।।

অপর এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সবচেয়ে বড় গুনাহ হল তিনটি, তার মধ্যে প্রথম হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করা। (সহীহ বুখারী হা: ৬৮৭০-৭১)

দ্বিতীয় উপদেশ:

আল্লাহ তা'আলার হকের পর বান্দার মাঝে যারা বেশি হকদার তাদের হক সম্পর্কে সচেতন করছেন। তারা হলেন পিতা-মাতা। তিনি তাঁর ছেলেকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য নসীহত করলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোরালো আদেশ করেছেন। এমনকি কুরআনে প্রত্যেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলার অধিকারের পর পিতা-মাতার অধিকারের কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا)

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত কর না ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে 'উফ্' বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:২৩)

এখানে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এর হিকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস গর্ভ ধারণ, প্রসব বেদনা, লালন-পালন, দুধ পান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

তবে পিতা-মাতা যদি এমন কোন বিষয়ের নির্দেশ দেয় যা বাস্তবায়ন করলে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করা হয় সেক্ষেত্রে তাদের কথা মানা যাবে না। তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। এমনকি তাদের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا)

"এবং বল: 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'' (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:২৩-২৪)

তৃতীয় উপদেশ:

তৃতীয় উপদেশ দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্মদর্শীতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন: হে বৎস! তুমি যে আমলই করা না কেন যদি তা সরিষার দানা পরিমাণও হয় আর তা যদি শিলাগর্ভে বা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে থেকে থাকে তাহলেও তা হাযির করে তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন। এর দ্বারা তিনি ছেলেকে সতর্ক করছেন যাতে কখনো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য ও পাপ কাজে লিপ্ত না হয়। আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি কোন জুলুম করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ)

"এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও সেটা আমি উপস্থিত করব; হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়াহ ২১:৪৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ)

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযালা ৯৯:৭-৮)

সুতরাং মানুষ গোপনে বা প্রকাশ্যে যত ভাল আর খারাপ কাজ করুক না কেন আল্লাহ তা'আলা তা কিয়ামতের দিন অবশ্যই উপস্থিত করবেন।

কেউ কেউ বলেন: صَخْرَةٌ হল যা সাত জমিনের নীচে থাকে। তবে এগুলোর ব্যাপরে সঠিক কথা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

চতুর্থ উপদেশ:

চতুর্থ উপদেশ হল কর্ম পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে। মানুষ যত আমল করে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সালাত। তাই তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি সালাত কায়েম কর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও, আদায় না করা অবস্থায় দশ বছর বয়সে পৌঁছলে প্রহার কর এবং বিছানা আলাদা করে দাও। (আবূ দাঊদা হা: ৪৯৫, সহীহ)

পঞ্চম উপদেশ:

পঞ্চম উপদেশ হল চরিত্র সংশোধন। ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম, ব্যক্তির সাথে সমষ্টির সংশোধন ও জীবনব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য সালাতের ন্যায় অবশ্য পালনীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে বাধা দেয়া। সে জন্য লুকমান (عليه السلام) বললেন: হে বৎস! তুমি সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলবে।

ষষ্ঠ উপদেশ:

ষষ্ঠ উপদেশ হল, যখন তুমি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে তখন মানুষের পক্ষ হতে অনেক কষ্ট, বিপদ তোমাকে আঘাত করবে। আর তখন তোমার কাজ হল তুমি বিচলিত না হয়ে ধৈর্যধারণ করবে। কেননা এটা দৃঢ় সঙ্কল্পের একটি কাজ।

সপ্তম উপদেশ:

তুমি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে মানুষকে অবজ্ঞা কর না। এবং উদ্ধতভাবে জমিনে বিচরণ কর না। কেননা আল্লাহ তা'আলা উদ্ধত, অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ج إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا)

"ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ কর না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবে না।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৩৭)

হারিস বিন ওয়াহাব খুযা'য়ী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের পরিচয় বলে দিব না? তারা কোমল স্বভাবের লোক, মানুষের কাছেও কোমল বলে পরিগণিত। যদি তারা কোন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই পূর্ণ করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসীদের পরিচয় বলে দিব না? তারা

কঠোর স্বভাবের লোক, দাম্ভিক ও অহংকারী। অপর সনদে আনাস বিন মালেক (رضي الله عنه) বলেন: মদীনাবাসীদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে তার প্রয়োজনে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাত ধরে যেখানে চাইতো নিয়ে যেত। (অর্থাৎ তার উদ্দিষ্টস্থলে হাত ধরে নিয়ে যেত। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও তার সাথে সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। এমনই কোমল স্বভাবের ছিলেন তারা। অথচ তিনি তখনও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন।) (সহীহ বুখারী হা: ৬০৭০, সহীহ মুসলিম হা: ২৮৫৩)

অষ্টম উপদেশ:

তুমি সংগতভাবে জমিনে তোমার পা ফেলবে। খুব ধীরে ধীরেও নয় আবার দম্ভভরেও নয়। বরং মধ্যম পন্থায় চলবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার বান্দারা জমিনে নম্রভাবে চলাফেরা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَي الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا)

'রাহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'। (সূরা ফুরকান ২৫:৬৩)

নবম উপদেশ:

তুমি কথা বলার সময় নীচু স্বরে কথা বলবে। কেননা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বর হচ্ছে গাধার স্বর। তাই তুমি গাধার মত উচ্চ স্বরে কথা বল না। বরং তোমরা কথায় নম্রতা বজায় রাখবে। হাদীসে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কামনা কর। আর যখন গাধার ডাক শুনবে তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। (সহীহ বুখারী হা: ৩৩০৩, সহীহ মুসলিম হা: ৮২)

সুতরাং প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত তার সন্তানকে এ সকল উপদেশ প্রদান করা। ফলে সন্তান আদর্শবান হবে এবং পিতা-মাতার বৃদ্ধ অবস্থায় সেবাযত্ন করবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তানদেরকে লুকমান (عليه السلام)-এর মত উপদেশ প্রদান করা।

২. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। কেননা শির্ক হল সবচেয়ে বড় গুনাহ।

৩. আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার পাশাপাশি পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৪. কিয়ামতের মাঠে মানুষের সমস্ত আমল উপস্থিত করা হবে এবং সেই অনুপাতে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।

৫. প্রতিটি পিতা-মাতা সন্তানকে সালাত কায়েম করার, সৎ কাজের আদেশ করার, অসৎ কাজে বাধা এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিবে।

৬. অহংকার পতনের মূল, তাই কোন প্রকার অহঙ্কার করা যাবে না।

৭. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করা যাবে না।

৮. সংযতভাবে চলা ফেরা করতে হবে।

৯. উচ্চকণ্ঠে নয় বরং নম্রভাবে কথা বলতে হবে।

ادْعُ إِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجٰدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

আপনি মানুষকে দা'ওয়াত [১] দিন আপনার রবের পথে হিকমত [২] ও সদুপদেশ [৩] দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায় [৪]। নিশ্চয় আপনার রব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি বেশি জানেন এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালভাবেই জানেন।

[১] (دعوة) এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহবান করা। নবীগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান করা। এরপর নবী ও রাসূলগণের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ পদবী হচ্ছে- আল্লাহর দিকে আহবানকারী হওয়া। এক আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে-

(وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا)

[আল-আহযাবঃ ৪৬] এবং অন্য এক আয়াতে আরো বলা হয়েছে-

(يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ)

[আল-আহকাফঃ ৩১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে এ সম্বন্ধে বলা

(وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।" [আলে-ইমরানঃ ১০৪] অন্য আয়াতে আছে-

(وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ)

-অর্থাৎ "কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়?" [ফুসসিলাতঃ ৩৩]

[২] হেকমত' শব্দটি কুরআনুল কারীমে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন মুফাসসির হেকমতের অর্থ নিয়েছেন কুরআন, কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ। [তাবারী] আবার কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। [ফাতহুল কাদীর] আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে বিশুদ্ধ ও মজবুত সহীহ কথাকে হেকমত বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

[৩]

(وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) -

موعظة-وعظ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায় [ফাতহুল কাদীর] উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। [ইবন কাসীর] (الْحَسَنَةِ) -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই- শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। (موعظة) -শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকর ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমান বোধ করে। এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য (حسنة) শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই সদুপদেশ। এ দুটিই মূলত: দাওয়াতের পদ্ধতি। কিন্তু কখনও কখনও

দায়ী-র বিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে নামাতে হয়। তাই কিভাবে সেটা করতে হবে তাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]

[৪] (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ)

جادل শব্দটি (مجادلة) ধাতু থেকে উদ্ভুত। (আরবি) তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। (بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ) -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক শুধু মুসলিমদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে,

(وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ)

[আল-আনকাবূতঃ ৪৬] -অন্য আয়াতে মূসা ও হারুন আলাইহিস সালাম-কে

(فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا)

[ত্বাহাঃ ৪৪] নির্দেশ দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, ফিরআওনের মত অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ الْأُمُورِ

তারা [১] এমন লোক যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে [২], যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সব কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।

৪১ নং আয়াতের তাফসীর:

মু'মিনদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করলে তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের যে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে তা উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনরা খেলাফতের দায়িত্ব পেলে সর্ব প্রথম সালাত কায়েম করবে এবং সকল মুসলিমদেরকে সালাত আদায় করতে বাধ্য করবে। রাষ্ট্রের মধ্যে যাদের যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকবে তাদের থেকে যাকাত আদায় করে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করবে এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সৎ কাজের নির্দেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা দিবে। এ যদি হয় একটি রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র এবং দায়িত্বশীলদের প্রধান কর্তব্য তাহলে সে রাষ্ট্রে কোন অন্যায়-অবিচার, খুন-গুম, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, চুরি-ডাকাতি এবং দুর্নীতি থাকবেনা। কারণ সালাত মানুষকে অশ্লীলতা, অন্যায় কাজসহ যাবতীয় শরীয়ত গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। কোন নামাযী ব্যক্তি অন্যায় কাজে জড়িত হয় না, দুর্নীতি করে না, রাষ্ট্রের মাল আত্মসাৎ করে না। যাকাত আদায় হলে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকল অপরাধ উঠে যাবে।

আর এসব কাজে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ না থাকলে অসৎ কাজে জড়িত হওয়া কার দুঃসাহস হবে? এরূপ শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ রাষ্ট্র খেলাফতে রাশেদা ও প্রথম শতাব্দীর ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সে কারণে তাদের রাষ্ট্রে কোন অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়নি। এ যুগগুলোকে বলা হয় স্বর্ণযুগ। মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল, তাদের দুর্নীতি ধরার জন্য কমিশন গঠন করতে হয়নি, বিচার-ফায়সালার জন্য আলাদা কোন ট্র্যাইবুনাল গঠন করা হয়নি। প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে কোন কিছুই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, অরাজকতা দূর করতে পারবে না, যদি ইসলামের বিধানের দিকে সকলে ফিরে না আসে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰٓي اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)

"যদি সে সকল জনপদের অধিবাসী ঈমান আনত ও তাক্বওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।" (সূরা আ'রাফ ৭:৯৬)

অতএব প্রতিটি মুসলিম শাসকের উচিত হবে ইসলামের অনুশাসন মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করা, এতে দুনিয়াতে যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি সে শাসক নাগরিকের সৎ আমলের নেকীর অংশ পাবেন।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান দায়িত্বগুলো জানতে পারলাম।

২. যে দেশ বা এলাকার লোক ঈমান ও তাক্বওয়া অবলম্বন করবে তাদেরকে আকাশ ও জমিনের বরকত দেয়া হবে।

৩. দেশে সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বাধা দিলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।